ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 176-185
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.447

রন্ধনকেন্দ্রিক নারী জীবন ও এক দেশহারা নারীর আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি: প্রসঙ্গ কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'

বৈশাখী বর্মন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The primary need of human is food. As they have evolved from food gatherers to food producers, the type of food eat has changed. Time to time humans have experimented with food and evolved it from just a dish to the masterpiece of craftmanship. Gradually, food has become an identity of the culture of any community.

In patriarchal society cooking is associated with the idea of woman. People believe that in a family only female members has the responsibility of cooking. For this kind of gender identity of women in a patriarchal society, neither household works nor women ever treated seriously. Though women do tremendous job in everyday life to run a family but they never get a piece of appreciation. They have always treated as second sex in a patriarchal society. But after many years of struggle and movements, women have snatched some rights for themselves. These struggles and movements have some impacts on literature. Some narrators take inspiration from feminist movements and reflect it in their creation. These kinds of literatures play an important role to know the situation of women in our society and analyse it. In Kallal Lahiri's 'Induabla Bhater Hotel', an exiled women treis to build her own identity through her dishes. Her journey has become a journey of self-exploration.

Keywords: Indubala Bhater Hotel, cooking-centric women's life, self-discovery, social construction of femininity, stateless/displaced woman

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান মানুষের চিরকালের প্রাথমিক চাহিদা। খাদ্য সংগ্রাহক থেকে যখন মানুষ খাদ্য উৎপাদকের অবস্থায় উত্তীর্ণ হল তখনও মানুষের প্রাথমিক চাহিদা একই রয়ে গেল। কিন্তু তার রূপ গেল পাল্টে। উৎপাদক মানুষ নিজের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে শিখলে সেই খাদ্যকে সে আরো উপাদেয় করে তুলতে চায়ল। ক্রমে খাদ্য শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হল। খাদ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল মানুষের সংস্কৃতি। বিভিন্ন বিচিত্র সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে এল পরিবর্তন। তাই মিশ্র সংস্কৃতির বাহক বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও এই মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া রন্ধন যে একটি বিজ্ঞান তা বুঝতে শিখলে মানুষ খাবারকে নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করল। ফলে রন্ধন হয়ে উঠল এমন এক বিজ্ঞান যার চর্চা পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে।

কিন্তু রান্নার এই শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলিকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে অনেক পরে। উনিশ শতকে বাংলার প্রথম রান্নার বই বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাকরাজেশ্বর' প্রকাশিত হয় বর্ধমানরাজ মহতাব চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু সেই বইয়ে যে রন্ধন প্রণালীগুলি (recipes) ছিল সেগুলি তাঁর নিজের নয়। বেশিরভাগ রন্ধন প্রণালীই মুঘল ঘরানার বিভিন্ন পদের। সেটি হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ সেই সময় রান্নার সঙ্গে পুরুষের যোগ ছিল খুব কম। হিন্দু বাড়ির রাঁধুনে বামুন বা মুসলিম বাড়ির খানসামা বাদে পুরুষরা রান্নাঘরের দিকে খুব একটা পা বাড়াত না। অন্যদিকে অন্দরমহলের নারীর জীবন ছিল রন্ধন কেন্দ্রিক। রান্নার সঙ্গে ছিল তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু নারীর এই শিল্পচর্চা তখনও শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। যদিও সকলের হাতে রান্না শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছাত না। কিন্তু রান্নার সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যদিও উনিশ শতকে এর খানিক পরিবর্তন দেখা যায়। বেশ কিছু শহুরে উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাড়িতে রাঁধুনির আগমন ঘটে। ফলে রান্নাঘরের সঙ্গে নারীর সম্পর্কে খানিক ছেদ ঘটে। কিন্তু সামাজিক এই পরিবর্তন রক্ষণশীল সমাজের চোখে ভাল বোধ হয় না। তাই নারীকে উপদেশ দেওয়ার জন্য লেখালিখি শুরু হয়। সত্যচরণ মিত্রের 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ', ঈশানচন্দ্র বসুর 'নারী নীতি', সর্বোপরি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এই ধরনের প্রচার পুস্তিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'ও এব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। তার কারণ 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র পাঠিকা ছিল উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত মেয়েরা। তাদের শিক্ষার প্রতি সমাজের আগ্রহের প্রধান কারণ এই যে, শিক্ষিত মায়ের দ্বারা সন্তান প্রতিপালনে অনেক সুবিধে হয়। এমনকি মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষাতেও সমাজের কিছু মানুষ ততক্ষণ সমস্যা অনুভব করেনি যতক্ষণ,

> "স্ত্রী ইংরেজি শিখলে ভালো হয়, কিন্তু তাঁরা 'বিবি' হবে না, হবে না ব্যতিক্রমী চরিত্র। পা বাড়াবে না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর বাইরে।"[১]

এমনকি 'নারী ও পরিবার' বইয়ের সম্পাদক ভারতী রায় তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

> "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ. ১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পর্যন্ত ভর্ৎসনা করল ইংরেজি আদর্শ প্রভাবিত মেয়েদের ইংরেজ রমণীসম বিলাসিতা ও গৃহকর্মে অমনোযোগিতার জন্য। তাঁদের শিক্ষিতা ও সংস্কৃতা করার উদ্দেশ্য তো সুমাতা, সুভার্যা এবং সুগৃহিণী তৈরি করা।"[২]

'বামাবধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত লেখাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী বিনোদিনী সেন তাঁর 'গার্হস্থ্য প্রবন্ধ'এ লিখেছেন,

> "গৃহকর্ত্রী নিজে রন্ধনকার্য্য না করিলে বা রন্ধনের তত্ত্বাবধান না লইলে রন্ধন কখন পরিষ্কৃত ও উত্তম হয় না।"[৩]

আবার আশ্বিন ১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গৃহিণী' প্রবন্ধে রচয়িতা বলেছেন,

> "যে স্বামী আমাদের বিদ্যা উপার্জন ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য এবং নানা রকম সুখ সচ্ছন্দতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহার আহারাদির জন্য যৎকিঞ্চিত পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হই। আমাদের এই পাপের শাস্তি অবশ্য একদিন ভুগিতে হইবে।"[৪]

বৈশাখ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মিসেস ডি এন দাস তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন,

> "বাল্যাবস্থা হইতেই মেয়েরা গৃহকর্ম্মকে যেন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে শিখে... আর প্রত্যহ দু একটা ব্যঞ্জন রাঁধাও বালিকাদিগকে শিখিইবে।"[৫]

অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের সুগৃহিণী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের প্রবন্ধগুলি রচিত হত।

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীর যুগে হিন্দু রমণীদের প্রতি সমাজের প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়। হিন্দু রমণীদের বিশেষ করে হিন্দু মায়েদের দেবী প্রতিপন্ন করে তাদের ওপর বীর্যবান, দেশপ্রেমিক সন্তান গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়। ফলে নারীদের ব্যক্তিগত জগত বদলে যায়। পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিষেধ অন্য চেহারায় শাসন করে নারীদের। তার প্রভাব দেখা যায় রান্নাঘরেও। নারীদের উপদেশ দেওয়া হয় শিশুর খাদ্য তালিকায় এমন সব খাবার রাখার ব্যবস্থা করার যা শিশুকে শারীরিক দিক থেকে বলবান করে তুলবে। সে খাদ্য প্রস্তুত করার ভারও মায়েদের ওপর দেওয়া হয়, কারণ,

> "গৃহকর্ত্রী নিজে রন্ধনকার্য্য না করিলে বা রন্ধনের তত্ত্বাবধান না লইলে রন্ধন কখন পরিষ্কৃত ও উত্তম হয় না।"[৬]

অর্থাৎ অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের প্রতি সমাজ যে উপদেশগুলি দিত তার মধ্যে অন্যতম ছিল রন্ধন সংক্রান্ত উপদেশ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত রান্নার বই 'পাকপ্রণালী'তেও বলেছেন,

> "রমণী-গণ-ই গৃহের লক্ষ্মী; অন্নপূর্ণার ন্যায় তাঁহার স্বীয় হস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনকে আহার প্রদান করিলে যে, কি সুখের ও পরিতোষের কারণ হয়, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।"[৭]

এই ধরনের উপদেশ ও শিক্ষা বালিকা বয়স থেকে লাভ করে বড় হলে একজন নারী রান্নাকেই তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে এবং এই কাজের জন্য পরিবারের কাছের মানুষের কাছে প্রশংসা বা স্বীকৃতিও আশা করে না। এই সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে যৌথ অবচেতন ও কোড অব কন্ডাক্টের ধারণা থেকে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও রন্ধনকে একমাত্র মেয়েদের দায়িত্ব ও তাদের উপযোগী কাজ বলে মনে করেন। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে জানিয়েছেন যে তাঁর পিতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রন্ধনকে বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবেই দেখতেন। তাই তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে উভয়কেই রান্না শিখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী সমাজের যৌথ অবচেতন ও কোড অব কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ এড়াতে পারেননি। তিনিও মনে করতেন যে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার রান্নার দায়িত্ব গৃহিণীদের হাতেই থাকা উচিৎ। তাই তিনি বলেন,

> "আজ কালকার অবস্থা ঠিক করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের পরিবারের মহিলাদের হস্ত হইতে রাঁধিবার ভারটা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে...কাজেই আহারাদির ভার রাঁধুনি বামুন এবং দাসদাসীদের উপরেই একরকম গিয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই আমরা ভাল আহার পাই না।"[৮]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ছবি বিভিন্ন সময়ের বাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে এমন মনোভাবের প্রকাশ প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের ব্যাধ খণ্ডে কবি লিখেছেন—

> "ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে কহে রামা হাট বিবরণ।
> আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে আগে ধর্মকেতুর ভোজন।।"[৯]

এই কাব্যের বণিক খণ্ডেও একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়—

> "প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধে খুল্লনা নারী
> সোঙরিয়া সর্বমঙ্গলা।"[১০]

অর্থাৎ কোথাও শাশুড়ির আদেশ আবার কোথাও স্বামীর আদেশে রান্না করেছেন মধ্যযুগের নারীরা। তাদের নিজস্ব স্বর সেই সময়ের সাহিত্যে না থাকা সেই যুগেরই বৈশিষ্টকে চিহ্নিত করে। উনিশ শতকে অন্তঃপুরবাসিনীদের নিত্যদিনের কাজ কর্মের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায় রাসসুন্দরী দাসীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'এর প্রতিটি স্তরে। রাসসুন্দরী দেবী জানিয়েছেন তাঁর এক খুড়ীমার শারীরিক অসুস্থতা দেখে তাঁর সাহায্য করতেই রাসসুন্দরী দেবী প্রথম রান্নার কাজ শেখেন। তারপর থেকে গার্হস্থ কাজের জগতে তাঁর প্রবেশ। তিনি বলেন,

> "সেই হইতে আমার ধূলা-খেলা ভাঙ্গিল, আর খেলা ছিল না, আমি কেবল কাজই করিতাম।"[১১]

সাংসারিক কাজের পরিধি বিয়ের পরে আরও বিস্তৃত হয়েছিল। যৌথ পরিবারের বিপুল রান্নার ভার পড়েছিল রাসসুন্দরীর উপরে। তিনি লিখেছেন—

> "ঐ বাটীতে আটজন চাকরাণী ছিল, তাহারা বাহিরের লোক। সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একামাত্র ছিলাম। আমি পূর্ব্বের ঐ নিয়ম মত সংসারের সমুদয় কাজ করিতাম! অধিকন্তু ঐ কয়েকটি সন্তান পালন করিতে হয়। এই সকল কাজের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না, কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না।...ঐ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ঐ ছেলে কয়েকটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া, আমাদের ঘরের রান্নার সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক সন্ধ্যায় দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটীর কর্ত্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। এজন্য আগে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।"[১২]

এভাবেই সমাজ নির্ধারিত পথেই সংসার জীবন যাপন করেছিলেন রাসসুন্দরী দাসী। এই চিরাচরিত পথের বাইরে বেরানোর কথা ভাবেননি তিনি। বরং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, সভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে ও ভরা সংসারের জন্য বার বার ধন্যবাদ দিয়েছেন ঈশ্বরকে। কিন্তু তাঁর জীবনের এই বর্ণনা থেকে আমরা খুঁজে পাই তৎকালীন সময়ের অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের রন্ধন, সন্তান উৎপাদন ও সন্তান পালনের দায়িত্ব কেন্দ্রিক জীবনের ছবি। যে রান্নাঘরের সঙ্গে মেয়েদের আজীবনের সম্পর্ক ছিল সেই রান্নাঘর তাদের আত্মপরিচয়ের দ্যোতক হয়ে ওঠেনি তখনও।

মেয়েদের পাকশালা কেন্দ্রিক জীবনের প্রায় একই রকমের ছবি ফুটে ওঠে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে। সত্যবতীর পিসিমা মোক্ষদা হঠাৎ উপলব্ধি করেন,

> "সারা বছরটাই রোদে পুড়ে মোলেন তিনি। এই তো কচি আমের আমতেল, এর পরই বাখড়া বাঁধা আমের গুড়-আম, মশলা-আম, তার পরেই আমসত্ত্বর মরসুম...দু-তিনটে মাসই শুধু রোদে পোড়ার ছুটি, বর্ষা শেষ হতেই দুর্গোৎসবের সুর ওঠে। দুর্গোৎসবের আগে সারা ভাঁড়ারটাতেই তো ঝাড়া বাছা রোদে দেওয়ার ধূম চলে, তারপর পরে তিলের নাড়ু।"[১৩]

এভাবেই মেয়েদের জীবনের বারো মাসের সঙ্গে জড়িত রান্না। বিধবা মোক্ষদা দাদার সংসারের রান্নাঘরের গণ্ডি থেকে বেরাতে পারে না সারা জীবন। মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয়ে যায় এই জীবনের প্রতি। কিন্তু এর বাইরে সে বেরাতে পারে না। কারণ রান্নাঘরের বাইরের নারী জীবনের পরিধি তাঁর জানা নেই।

উনিশ শতকের নবজাগরণের পরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও সেই শিক্ষার বেশিরভাগটাই ছিল সুগৃহিণী তৈরির শিক্ষা। সেই শিক্ষা নারীদের বহির্মুখী করলেও তাদের মুক্ত করতে পারেনি। বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গতি লাভ করে। বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ১৯২৭ সালে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন প্রথমে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও কালক্রমে তার সদস্যরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমান্তরালে চলা নারী মুক্তি আন্দোলন স্বাধীন দেশে নারীদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর প্রকাশে সহায়তা করে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির হাত ধরে ভারতে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হলেও তা ক্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

নারী মুক্তি আন্দোলন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের সাহিত্যে। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরে লেখা অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা 'নির্বাস' উপন্যাসে যখন কনভেন্টে পড়া বিমলা রান্নাবান্নাকে শুধু মেয়েদের কাজ বলেছে তখন উদ্বাস্তু কলোনির এক সাধারণ মেয়ে মালতি বিমলার কথার প্রতিবাদ করেছে। তার রাজনৈতিক বোধ তাকে লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নে সজাগ করে তোলে।

এভাবেই বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে নারী মুক্তি আন্দোলন। 'নির্বাস' রচনার প্রায় দু দশকেরও বেশি সময় পরে কল্লোল লাহিড়ী রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'। ইতিমধ্যে ভারত ও বিশ্বের রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নে বহু আন্দোলন ঘটেছে ও ঘটছে। উদার অর্থনীতি ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি নারীর সমান অধিকারের আন্দোলনকেও মুনাফা লাভের সুযোগে পরিণত করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি পিতৃতন্ত্রের আগল আরো মজবুত করেছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে দাঁড়িয়ে কল্লোল লাহিড়ী এক দেশহারা নারীকে কেন্দ্র করে রচনা করলেন এমন এক কাহিনি যে কাহিনির পটভূমি কলকাতার এক এঁদো গলি ছেনু মিত্তির লেনের এক পুরোনো বাড়ি যেখানে সময় এগোতে চায় না।

উপন্যাসটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বাঙালির অতি পরিচিত সুস্বাদু এক একটি পদের নামে পরিচ্ছেদ গুলির নামকরণ। আর এই এক একটি পদের সঙ্গে জড়িয়ে ইন্দুবালার বিশেষ বিশেষ সব স্মৃতি। এই স্মৃতি যাপন করেই দিন কাটে ইন্দুবালার।

বাংলাদেশের কলাপোতা নামে এক অখ্যাত গ্রামের মেয়ে ইন্দুবালা। কলাপোতা গ্রামেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ঠাকুরদার পাঠশালাতে প্রাথমিক শিক্ষার পরে কিছুদিন গ্রামের স্কুলেও পড়েছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা ও বাবা দুজনেই যৌবনে কিছু সময় কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। ঠাকুরদা কলকাতায় গিয়েছিলেন কাজের সূত্রে। আর তাঁর বাবা পড়াশুনার জন্য কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন। গ্রামে ফিরে এসে ঠাকুরদা একটি পাঠশালা খোলেন। সেই পাঠশালাতেই ইন্দুবালার প্রাথমিক শিক্ষা। তাই ধনী না হলেও রুচিশীল পরিবার ছিল ইন্দুবালাদের। সেই ইন্দুবালার কিশোরী বয়সে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সহপাঠী মনিরুলের সঙ্গে। মনিরুলের বাঁশি বাজানো আর নকশীকাঁথার মাঠ পড়া শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত কিশোরী ইন্দুবালা। মা সেই প্রেমের আঁচ পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে তাঁদের গ্রামে ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করতে গিয়ে মারা যায় এক যুগল। দিনে দিনে বেড়ে ওঠা ইন্দুবালার রূপ ও কিশোর বয়সের প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর মা কে চিন্তিত করে তোলে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

মা মেয়ের বিয়ে দিতে চান। বাবাও বুঝতে পারেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে পিতৃপুরষের ভিটে আগলানো বেশিদিন সম্ভব হবে না। তাই তিনি মেয়ের বিয়ে দেন ভারতে, এক দোজবরের সঙ্গে।

অন্যদিকে ছেনু মিত্তির লেনে মাস্টার রতনলাল মল্লিকের মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়ার জন্য। রতনলাল মল্লিকের প্রথম স্ত্রী কীভাবে মারা গেছে তা এক রহস্য। তাই জ্ঞাতি কুটুম্বকে না জানিয়ে চুপচাপ বাংলাদেশে ছেলের সম্বন্ধ করেন তিনি। বহির্মুখী নেশাগ্রস্ত লম্পট ছেলেকে ঘরমুখো করার জন্যই তাঁর এই আয়োজন। ছেলের বিলাসিতায় পৈতৃক সম্পত্তির বেশিরভাগটা গেছে। যে টুকু বেঁচে আছে তা আগলে রাখার জন্য তিনি ছেলের বিয়ে দেন ইন্দুবালার সঙ্গে। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইন্দুবালার রূপ ও যৌবন ঘরমুখো করে রাখবে তাঁর লম্পট ছেলেকে।

বিয়ের দিনই ইন্দুবালার পরিবারের আশাভঙ্গ হয় বরকে দেখে। রতনলাল মল্লিক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। তার নাক ডাকার আওয়াজে ইন্দুবালা বাসর ঘরে থাকতে পারেন না। বিয়ের দিনই মোহভঙ্গ হয় ইন্দুবালার। কলকাতার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গ্রামের সমবয়সীরা ইন্দুবালাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল কলকাতায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তা নিমেষেই মিলিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ তাঁদের স্টেশনে নিতে আসেনি। এমনকি শ্বশুরবাড়িতেও কোনো আত্মীয়স্বজন আসেনি। নববিবাহিত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পৌছাঁতে এসেছিলেন ইন্দুবালার বাবা ও তাঁর ছোট ভাই। কিন্তু তাঁদের দেখে খুশি হননি ইন্দুবালার শাশুড়ি। বাড়ির দরজা থেকেই বিদায় নেন তাঁরা। আর ইন্দুবালাও ছেনু মিত্তির লেনের এই বাড়ি থেকে আর কোনদিন কোথাও যেতে পারেন না। ইন্দুবালা বুঝতেও পারেন না যে সেদিনই বাবার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

ইন্দুবালার বৌভাতেও রতনলাল মল্লিকদের কোন আত্মীয় আসেনি। শাশুড়ির নির্দেশ মতো ইন্দুবালাকেই নিজের বৌভাতের আয়োজন করতে হয়। আয়োজনও হয় যৎসামান্য। বাড়ির পেছনের ছোট বাগান থেকে ইন্দুবালা যা পান তাই তুলে এনে রান্না করেন। তারপরে এই অভাব অনটনের সংসারই তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। এরপরে তাঁর স্বামী যখন মারা যায় তখন দিশেহারা যুবতী ইন্দুবালার পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাছওয়ালী লছমী। সেই ইন্দুবালার হাতে পয়সা তুলে দিয়েছিল ভাতের হোটেল খোলার। তারপর থেকে একদিনও ইন্দুবালা ভাতের হোটেল বন্ধ হয়নি। সেই হোটেলে ইন্দুবালা রান্না করেন তাঁর মা-ঠাকুমার স্মৃতি বিজড়িত এক একটি অসামান্য পদ। কুমড়ো ফুলের বড়াও তার মধ্যে একটি। বাড়ির পেছনের একচিলতে বাগানে সদ্য ফোটা কুমড়ো ফুল দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কলাপোতায় ঠাকুমার হাতে বানান কুমড়ো ফুলের বড়ার কথা। নিমেষে হোটেলের মেন্যু পাল্টে সেখানে কুমড়ো ফুলের বড়া যোগ করেন। আর ইন্দুবালার ঠাকুমার স্মৃতি জড়িত কুমড়ো ফুলের বড়ার নামেই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'কুমড়ো ফুলের বড়া'।

বিয়ের পরেও মাস্টার রতনলাল মল্লিকের স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিমধ্যে শাশুড়িও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শাশুড়ি মারা যাওয়ার আগে ইন্দুবালার কাছে খেতে চেয়েছিলেন বিউলির ডাল। মৌরী ফোঁড়ন দিয়ে বিউলির ডাল রেঁধেছিলেন ইন্দুবালা। আর সেই ডাল দিয়ে শাশুড়ি তাঁর জীবনের শেষ খাওয়া খেয়েছিলেন। এই বিউলির ডালের সঙ্গে ইন্দুবালার অনেক স্মৃতি জড়িত। নকশাল বিপ্লবী আলোক ও তার বন্ধুরাও অনেক রাতে ইন্দুবালার হোটেলে বিউলির ডাল আর আলুপোস্ত তৃপ্তি করে খেয়েছিল। সেই আলোক যার বুক ফুঁড়ে গিয়েছিল পাঁচ-ছ'টা গুলি। সেই আলোক যে ইন্দুবালাকে সম্বোধন করেছিল 'কমরেড' বলে। আলোককে তিনি দেখতে পান বর্তমানের কিংশুকের মধ্যে। কিংশুক, সুজিত এদের আবদারে ইন্দুবালা আবার রাঁধেন বিউলির ডাল।

ইন্দুবালার বৌভাতের দিন তাঁর শাশুড়ি তাঁর হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন খিড়কির বাগানের সামনে। সেখান থেকে কচি পুঁইশাক তুলে এনে বাপের বাড়ি থেকে আনা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে রাঁধেন ছ্যাঁচড়া। মাস্টার রতনলাল মল্লিক সেই ছ্যাঁচড়া আয়েশ করে খায়। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই রতনলাল মল্লিকের স্বভাব বুঝে ফেলেন ইন্দুবালা। আর বাড়ির সামনে এক কাবুলিওয়ালার সঙ্গে রতনলালের ঝামেলা হলে ইন্দুবালা জানতে পারেন যে রতনলাল টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় না। তাই তাকে বাজারের লোকে ছ্যাঁচড়া বলে। এই রতনলাল মল্লিক স্ত্রীর সমস্ত গয়না বিক্রি করে শেষে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে ফেলে মারা যায়। সেই থেকে রতনলালের মৃত্যুর দিনে ইন্দুবালা ছ্যাঁচড়া রান্না করেন। সেই রীতি তিনি বর্তমানেও বজায় রেখেছেন।

একইভাবে উপন্যাসের বাকি পরিচ্ছেদগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে ইন্দুবালার এক একটি স্মৃতি। 'আমতেল', 'মালপোয়া', 'চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল', 'চন্দ্রপুলি', 'কচুবাটা'— উপন্যাসের এই অধ্যায়গুলি ইন্দুবালার জীবনের এক একটি পর্বের সঙ্গে জড়িত। এই পদগুলি রান্নার মধ্যে দিয়ে তিনি পুরোনো স্মৃতির পাতা ওল্টান।

ইন্দুবালা ভাতের হোটেল ইন্দুবালার অস্তিত্বের সঙ্গে সামিল। এই হোটেল তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের সাক্ষ্য বহন করে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনটি সন্তান নিয়ে ইন্দুবালা যখন অসহায় তখন তাঁর বন্ধু হয়ে আসে মাছওয়ালী লছমী। জ্ঞাতিরা যখন সম্পত্তি জবরদখল করার জন্য ভয় দেখিয়েছে তখন বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে আলোক ও তার নকশাল বন্ধুরা। এদের সবার সঙ্গে ইন্দুবালার পরিচয় এই ভাতের হোটেলের সূত্রে। কিন্তু এরা সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। ইন্দুবালার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলো সবাই একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তাই হয়তো নিজের সন্তানদের তিনি এই ছেনু মিত্তির লেনের বাড়িতে তাঁর কাছাকাছি থাকতে দিতে চান না। প্রিয়জন বিয়োগের আশঙ্কা থেকেই হয়তো তাঁর একা থাকার সিদ্ধান্ত।

ইন্দুবালা একে একে জীবনে সব হারিয়েছেন। বিয়ের করে দেশ ছেড়ে আসার পরে তিনি আর কোনদিন দেশে ফিরে যেতে পারেননি। ঠাকুমার অসুস্থতা, বাবার মৃত্যু কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর আর প্রিয়জনদের কাছে যাওয়া হয় নি। তাঁর মা ও ভাইকে খান সেনারা জ্যান্ত জ্বালিয়ে মেরে ফেলে। তাঁদের গ্রামের বাস্তুভিটেটাও হয়তো নেই। তবুও নিজের দেশকে আরেকবার দেখার আশায় বড় ছেলে ও বৌমার অনুরোধে তিনি একবার বাংলাদেশ যেতে রাজি হন। কিন্তু স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, এই ট্রেন সেই ট্রেন নয় যে ট্রেনে চড়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। বুঝতে পারেন যে, সময় অনেক এগিয়ে গিয়েছে ছেনু মিত্তির লেনের বাড়ি ও তাঁকে ছাড়িয়ে। তিনি যা আগলে আছেন তা কেবলই স্মৃতির বোঝা। সেই স্মৃতির কাছে সশরীরে ফেরা যায় না। তাই তিনি স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। উপলব্ধি করেন তাঁর হোটেল বন্ধ করে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই হোটেল তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আসলে সমাজ নারীর অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে দিয়েছে রান্না এবং সন্তান পালন ও সন্তান উৎপাদনের দায়িত্বকে। যদিও সমাজ ও তার তৈরি আইন মনে করে যে, মা সন্তানের অভিভাবক নন। মা কেবল সন্তানের ধাত্রী ও প্রতিপালক। সন্তানের ও তার মায়ের অভিভাবক সন্তানের পিতা। এই ধারণা একটি সুচতুর পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক নির্মাণ থেকে সৃষ্ট যার নাম স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ।

সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছিলেন, "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে"। অর্থাৎ কোনো শিশুই লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মায় না। প্রতিটি শিশু নির্দিষ্ট যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার লিঙ্গ নির্মাণ করে সমাজ নির্ধারিত কোড অব কন্ডাক্ট। এই কোড অব কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ মেনে একটি মেয়ে সমাজের দ্বিতীয় লিঙ্গে পরিণত হয়। তার ভাগে পড়ে রান্না, যাবতীয় গৃহকর্ম, সন্তান পালন ও স্বামীসহ পরিবারের সদস্যদের

সুখ-শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব। পিতৃতন্ত্রে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী সমাজের এই ধারণাগুলিকে মেনে চলে ও বজায় রাখার চেষ্টা করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ধারণার প্রতিফলন ঘটে শিশু শিক্ষার বইগুলিতেও। 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগে দেখা যায়—

"ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড়ো বৌ।"[১৪]

এভাবেই ছোট থেকেই একটি শিশু কন্যাকে আদর্শ গৃহিণী করে তুলতে তৎপর থাকে সমাজ। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর প্রতাপতত্ত্ব বা ক্ষমতাতত্ত্বের দর্শন দিয়েও সমাজে নারী-পুরুষের এই বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। ফুকোর মতে ক্ষমতা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন ধারণা নয়। ক্ষমতা সমাজের প্রতিটি স্তরে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এই ক্ষমতা অর্জন করা যায় জ্ঞানের দ্বারা। পিতৃতন্ত্র পুরুষকেই জ্ঞানের উপযুক্ত ধারক ও বাহক বলে প্রতিপন্ন করে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ জীব ও সমাজে প্রথম লিঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। এই ধারণা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক নারীই পোষণ করে এবং বয়স, সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে ক্ষমতা ভোগ করে অপরকে বঞ্চিত করে। ইন্দুবালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর মা-ঠাকুমা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই পাঠ দিয়েছিলেন গৃহকর্মের। এই পাঠ তাঁকে বিবাহিত জীবনে পটু গৃহিণীতে হতে সাহায্য করেছিল। তিনি ততদিন নিজের উপার্জনের কথা ভাবেন নি যতদিন বেঁচেছিল মাস্টার রতনলাল মল্লিক। অন্তঃপুরবাসিনী ইন্দুবালা বহু কষ্টে সংসার করেছেন। বাবার দেওয়া সব গয়না বিক্রি করে রতনলাল জুয়া খেলেছে। ইন্দুবালাকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। কিন্তু তাও এসবের কোন কিছুর প্রতিবাদ করেননি ইন্দুবালা। তিনি উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিলেন দায়ে পড়ে, সন্তানের মুখ চেয়ে। উপার্জনের পথে তাঁকে হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছে মাছওয়ালী লছমী। নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়ায় তার পক্ষে তাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইন্দুবালা বাধ্য হয়ে যে পথ বেছে নেন ক্রমে তাই তাঁর আত্মপরিচয় হয়ে ওঠে।

ইন্দুবালা জীবনে সব দিক থেকেই বঞ্চিত। একে তিনি নারী, তারপরে দেশহারা। শাশুড়ির কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'রিফিউজি' তকমা। পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ হওয়ার ফলে যে ক্ষমতা ইন্দুবালার শাশুড়ির হাতে এসেছিল, কিন্তু যে ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি নিজের ছেলের ওপর করতে পারতেন না, তা তিনি একমাত্র পুত্রবধূর ওপর করতেন। অন্যদিকে ইন্দুবালার ভাই, মা, জীবনের প্রথম প্রেমিক মনিরুল মারা যান দেশের জন্য। তিনি সে সব খবর পান। কিন্তু একবারও দেশে ফিরতে পারেন না। ফলে যখন তিনি উপার্জনের পথে পা বাড়ান তখন তাকেই তিনি করে তোলেন তাঁর আত্মপরিচয়। নিজের দেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হয়ে ছেনু মিত্তির লেনের বাড়ির পেছনের একটুকরো বাগানই ইন্দুবালার কাছে হয়ে ওঠে একটুকরো কলাপোতা।

যে রান্নাকে সমাজ মেয়েদের অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করে সেই রান্নার মধ্যেই ইন্দুবালা ফুটিয়ে তোলেন নিজের স্বকীয়তা। রান্না হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পকর্ম, তাঁর নিজস্ব প্রকাশ। তাই ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যখন তাঁকে হোটেল বন্ধ করতে বলেন তখন তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন না। এমনকি ছেলেদের সঙ্গে যৌথ পরিবারেও থাকেন না তিনি। স্ত্রী শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন— সমাজের এই ধারণাকে মানেন না তিনি। তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা তাঁকে পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করার সাহস দেয়। এমনকি মহালয়ার দিনে তিনি তাঁর মৃত মা, বাবা, ভাই, স্বামী, প্রেমিক মনিরুল, আলোক, লছমী— এদের সবার উদ্দেশ্যে বাড়িতেই তর্পণ করেন। শাস্ত্র ও আচারে পুরুষের জন্মগত অধিকারের ধারণাকে নাকচ করেন ইন্দুবালা।

নিম্নবিত্ত অন্তজ শ্রেণির মধ্যে অন্দরমহল ও বাহিরমহলের বিভাজন বরাবরই কম। এই শ্রেণির মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি বাইরের কাজ করে। সেই নিম্নবিত্ত শ্রেণির লছমী ভেঙে দেয় বনেদী বাড়ির বৌ ইন্দুবালার সমস্ত সংকোচ। আর্থিক স্বাধীনতা তাঁকে সুযোগ দেয় আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের। স্মৃতির ঝুলি খুঁজে বের করে আনেন এক একটি অসাধারণ পদ যা ইন্দুবালা ভাতের হোটেলকে করে তোলে জনপ্রিয়। নিজের সৃজনশীলতাকে কেন্দ্র করে তৈরি এই জনপ্রিয়তা ইন্দুবালাও উপভোগ করেন। তাই শুরুর পরে একদিনও বন্ধ থাকে না ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। এই হোটেলই দেশহারা ইন্দুবালার একমাত্র আশ্রয়, তাঁর আত্মপরিচয়।

রেণুকা আর শেঠি ও মারি জে অ্যালেন 'সেকস রোল স্টিরিওটাইপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইউনাইটেড স্টেটস' নিবন্ধে পুরুষ ও নারী স্বভাবের কিছু সমাজ নির্ধারিত ধারণা তুলে ধরেন। এর মধ্যে দেখা যায় স্বনির্ভরতা ও কঠোর ব্যক্তিত্বময়তাকে পুরুষের ও স্নেহশীলতাকে নারীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে দেশ কাল নির্বিশেষে সকল সভ্য সমাজ। কিন্তু ইন্দুবালার মধ্যে এই তিনটি চারিত্রিক গুণই লক্ষ্য করা যায়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে যা একজন স্বাধীন মানুষের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। নিজস্ব আর্থিক উপার্জন ইন্দুবালাকে একজন স্বাধীন মানুষ করে তুলেছে। তাই রতনলাল মল্লিকের বিধবা বৌ ইন্দুবালা হয়ে ওঠেন একটি হোটেলের মালিক। স্ত্রী লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণকে তিনি ভাঙতে না পারলেও অনেকাংশে অস্বীকার করেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্ত 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' বইয়ে বলেছেন,

> "যে কোন বিপ্লব সফল করার একটা কৌশল নাকি রান্না ঘরে তার বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া। লিঙ্গসাম্যের বিপ্লব তো রান্নাঘরেই শুরু।"[১৫]

ইন্দুবালা সজ্ঞানে কোন বিপ্লবের সূচনা করেরনি। কিন্তু তাঁর স্বনামের এই হোটেল ছেনু মিত্তির লেনের এঁদো গলির বনেদিয়ানা ও তার ক্লেদজ সংস্কৃতির মধ্যে কোন বিপ্লবের থেকে কম নয়। ইন্দুবালা একই সঙ্গে হয়ে ওঠেন তাঁর সন্তানদের জন্মদাত্রী ও অভিভাবক, ধনঞ্জয়ের আশ্রয়দাত্রী, সর্বোপরি ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের মালিক। দেশহারা এক নারী, মল্লিক পরিবারের বৌ পরিচয়ের বাইরে আবিষ্কার করেন নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় যা তাঁর নিজস্ব অর্জন। আর এভাবেই 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' হয়ে ওঠে দেশহারা এক নারীর আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, ভারতী। সম্পাদনা। নারী ও পরিবার। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ৪।
২. তদেব, পৃ. ৪।
৩. তদেব, পৃ. ২০৭।
৪. তদেব, পৃ. ৮৯।
৫. তদেব, পৃ. ২৪।
৬. তদেব, পৃ. ২০৭।
৭. মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস। পাকপ্রণালী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩১৩, কলকাতা, পৃ. ২।
৮. দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী। আমিষ ও নিরামিষ আহার। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, পৃ. ১।
৯. মুখোপাধ্যায়, সুখময়। সম্পাদনা। চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৫৮।

১০. সেন, দীনেশচন্দ্র, বন্দোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, বসু, হৃষীকেশ। সম্পাদনা। কবিঙ্কন চণ্ডী দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬, পৃ. ৫১৫।
১১. দাসী, রাসসুন্দরী। আমার জীবন। দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৯।
১২. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩।
১৩. দেবী, আশাপূর্ণা। প্রথম প্রতিশ্রুতি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ৩০।
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রাথ। সহজ পাঠ প্রথম ভাগ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০, কলিকাতা, পৃ. ৬।
১৫. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. লাহিড়ী, কল্লোল। ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। সুপ্রকাশ, ২০২৩, কলকাতা।
২. দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী। আমিষ ও নিরামিষ আহার। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা।
৩. মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস। পাকপ্রণালী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩১৩, কলকাতা।
৪. রায়, ভারতী। সম্পাদনা। নারী ও পরিবার। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা।
৫. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। আনান্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০, কলকাতা।
৬. বসু (রায়), ছবি। বাঙলার নারী আন্দোলন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, কলকাতা।
৭. মুখোপাধ্যায়, সুখময়। সম্পদনা। চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪, কলকাতা।
৮. সেন, দীনেশ্চন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, বসু, হৃষীকেশ। সম্পদনা। কবিকঙ্কণ চণ্ডী দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬।
৯. দাসী, রাসসুন্দরী। আমার জীবন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, কলকাতা।
১০. দেবী, আশাপূর্ণা। প্রথম প্রতিশ্রুতি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২৬, কলকাতা।
১১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ। নির্বাস ও অরণ্য রোদন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সহজ পাথ প্রথম ভাগ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০, কলিকাতা।
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব। দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩, কলকাতা।